বাংলাদেশের শিল্পায়ন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা*

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান**

ভূমিকা

বাংলাদেশ দু'দুবার ঐপনিবেশিক শাসন ও শোষনের শিকার হয়েছিল - প্রথমবার ব্রিটিশ বেনিয়াদের ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক চক্রের ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। বৃটিশ বেনিয়া গোষ্ঠী তাদের দেশের শিল্পায়নের স্বার্থে আমাদের দেশকে ব্যবহার করেছে - কাঁচামাল বিশেষ করে নীলের যোগানদাতা ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসেবে। নির্যাতনের মাধ্যমে ধ্বংস করেছে আমাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত তথা মসলিন শিল্পকে। ধর্মের নামে পাকিস্তানের তথাকথিত স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক ও বেসামরিক শাসক চক্র পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করে। দীর্ঘ প্রায় ২৪ বছরের পশ্চিম পাকিস্তানী দুঃশাসন ও নিপিড়নের ফলে পূর্ব বাংলা এক ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়। পাকিস্তানী আমলে মূলতঃ পাট ও বস্ত্র খাতে কিছু শিল্প গড়ে ওঠে ষাটের দশকে যেগুলোর বেশীর ভাগেরই মালিকানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। ১৯৭১ - এ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ফলে ঐ সকল শিল্প মালিকরা পালিয়ে যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের আশা-আকাংখাকে ধারণ করে বাংলাদেশের প্রথম সরকার পরিত্যাক্ত ঐ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সকল বড় বড় শিল্প জাতীয়করণ করে। কিন্তু একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্র নতুন সরকারের এ জাতীয়করণ নীতি মেনে নিতে পারে নি। তারা এর বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। এমনি প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বঙ্গবন্ধুর সরকার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবিপ্লবী চক্রের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে এবং দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন (প্রথম বিপ্লব দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা যা ১৯৭১ সালে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়) এবং দেশের শাসন ব্যবস্থায় এক বিপ্লবী পরিবর্তন আনেন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ধাঁচের বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থা)। এমতাবস্থায়, সাম্রাজ্যবাদী-প্রতিবিপ্লবী চক্র মরিয়া হয়ে ওঠে এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাত করে এবং তাঁকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এর সাথে মৃত্যু হয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনের। সূচনা হয় বাংলাদেশের অন্ধকার যুগের।

---

* Presented at the Regional Conference 2003 jointly organized by the Bangladesh Economic Association and the Department of Economics, Rajshahi University held on October 23, 2003 at the Senate Building, Rajshahi University, Rajshahi.

** অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক ও বেসামরিক সরকারগুলো বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবির মত সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলোর পরামর্শে ঢালাও বেসরকারীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে শুরু করে। একই সময়ে শুরু হয় বেসরকারী খাতের বিকাশ। কিন্তু সামরিক জান্তাদের উচ্চাভিলাষ চারিতার্থ করতে গিয়ে বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচী যেমনি ভেস্তে যায়, তেমনি বেসরকারী খাতেরও বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়। উদ্ভব হয় নতুন এক সংস্কৃতির - ঋণ খেলাপী সংস্কৃতির যাকে সংস্কৃতি না বলে অপসংস্কৃতি বলাই শ্রেয়। প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার খেলাপী ঋণের অপসংস্কৃতি বর্তমানে আমাদের অর্থনীতিকে গ্রাস করে ফেলেছে। প্রায় ৩৩ বছরের দীর্ঘ ইতিহাসেও বাংলাদেশের অর্থনীতির ভীত গড়ে ওঠেনি। মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পের অবদান এখনও বাহাত্তরের পর্যায় অতিক্রম করতে পারেনি (পোষাক শিল্প ব্যতীত)। কৃষির আধুনীকায়ন সুদূর পরাহত রয়ে গেছে। বিকাশ ঘটেছে শুধু অনুৎপাদনশীল খাতসমূহের। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে উপরোল্লেখিত সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলোর পরামর্শে বেপরোয়াভাবে বেসরকারীকরণ শুরু করে। বিগত দু'বছরে তিন ডজনেরও বেশী সরকারী শিল্প-কলকারখানা হয় বন্ধ করে দিয়েছে, না হয় ব্যক্তিগত খাতে বিক্রি করে দিয়েছে। এমনকি লাভজনক সংস্থাগুলোকেও দক্ষতা বৃদ্ধির অজুহাতে ব্যক্তিগত খাতে বিক্রি করে দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার মানুষ বেকার হয়ে পড়ছে। এটা বিদ্যমান বেকারত্ব পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলছে। হ্রাস পাচ্ছে উৎপাদন। বেকারত্বের শিকার এসব মানুষ ক্রমশ প্রতিবাদী হয়ে উঠছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে সামাজিক অসন্তোষ। এহেন পরিস্থিতিতে সরকার ইতোমধ্যেই খুলনার অন্ততঃ তিনটি বন্ধকৃত পাটকল খুলে দেয়ার ঘোষনা দিতে বাধ্য হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই আমরা বাংলাদেশের শিল্পায়নের বর্তমান চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছি। চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি শিল্পায়নের পথের প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং উন্মোচন করতে চেয়েছি তার সম্ভাবনার দিগন্তসমূহ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের শিল্পায়ন পরিস্থিতির একটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষন উপস্থাপনের চেষ্টা করা। এ লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে আমরা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করেছি ঃ

(১) বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শিল্পায়নের অর্থ ব্যাখ্যা করা ;
(২) বাংলাদেশের শিল্পায়নের একটি চিত্র উপস্থাপন করা ;
(৩) আমাদের দেশের শিল্পায়নের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা ;
(৪) আমাদের দেশের শিল্পায়নের সম্ভাবনাসমূহ খতিয়ে দেখা ;
(৫) পরিশেষে বাংলাদেশের দ্রুত ও টেকসই শিল্পায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু সুপারিশ তুলে ধরা।

পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার প্রকাশিত উৎস থেকে নেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা ও ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস ২০০৩। এ ছাড়া শিল্পায়ন সম্পর্কিত দেশী-বিদেশী পুস্তক, গবেষণা

গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ, সাময়িকী ও সংবাদপত্রের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শিল্পায়ন

শিল্পায়ন শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে লেটিন শব্দ industria থেকে যার অর্থ হচ্ছে উদ্দ্যোগ বা কর্মকান্ড। কোন অর্থনীতিতে বা এর কোন খাতে বৃহৎ যান্ত্রিক উৎপাদন সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে শিল্পায়ন বলে। শিল্পায়ন দেশের অর্থনীতিতে শিল্পজাত পণ্যের আধিক্য সৃষ্টি করে। শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় একটি দেশ কৃষি প্রধান দেশের নাম ঘুচিয়ে শিল্প প্রধান দেশে রূপান্তরিত হয়। যেমন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড। আবার কৃষি-শিল্প প্রধান দেশ থেকে শিল্প-কৃষি প্রধান বা শিল্প প্রধান দেশেও রূপান্তরিত হতে পারে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি। অর্থনীতির কোন বিশেষ খাতের, ধরা যাক কৃষি খাতের শিল্পায়নের অর্থ হচ্ছে খাতটিকে শিল্প বা যান্ত্রিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো। তবে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শিল্পায়নের লক্ষ্য, এর প্রকৃতি, গতি, ফলাফল ইত্যাদিও বিভিন্ন হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী শিল্পায়ন শুরু হয় গ্রেট বৃটেনে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। কতগুলো উপাদান ঐ দেশটিতে শিল্প বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করেছিল। প্রথমতঃ বৃটিশরা ইতোমধ্যেই বিশাল ঐপনিবেশিক সাম্রাজ্য কায়েম করেছিল। বলা হয়ে থাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না। উত্তরের কানাডা থেকে দক্ষিনের অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ সাম্রাজ্য। উপনিবেশগুলো লুন্ঠনের মাধ্যমে তারা সম্পদশালী হয়েছিল। এগুলোকে তারা বাজার এবং খাদ্য ও কাঁচামালের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছিল। দ্বিতীয়তঃ ঐ সময়ে দেশটিতে প্রযুক্তিগত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। আর্করাইটের স্পিনিং মেশিন, জেমস ওয়াটের বাস্পীয় ইঞ্জিন, হারগ্রিভসের ওয়েভিং মেশিনসহ বেশ কিছু আবিস্কার হস্তচালিত উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বৃহৎ যন্ত্রচালিত উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। আর এর অর্থ এই যে, প্রযুক্তিগত বিপ্লব পরবর্তীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু নাগাদ বৃটেনে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীতে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও শিল্প বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছিল।

শিল্প বিপ্লবের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছিল মেশিন উৎপাদনের জন্যে মেশিন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। বৃহত মেশিন শিল্প অর্থনীতির সকল খাতে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। ধ্বংস করেছিল পণ্য উৎপাদনের সেকেলে পদ্ধতি। ফলে উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছিল বহুগুনে। শুরু হয়েছিল উৎপাদনের ঘনীভবন প্রক্রিয়া। শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র শিল্প উৎপাদনকেই প্রভাবিত করেনি, অর্থনীতির অন্যান্য খাতের উপরও এর প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বাগ্রে এর প্রভাব পড়েছিল কৃষি ও পরিবহনের উপর। কৃষি শিল্পের ক্রমবর্ধমান কাঁচামালের চাহিদা পুরণ করতে থাকে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার এবং অন্যান্য শিল্পজাত পণ্যের ব্যবহারকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। অন্যদিকে পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয় রেল লাইন। আর রেল পথের উন্নয়ন নির্ভরশীল ছিল জ্বালানী ও ধাতুর উৎপাদনের উপর। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে অন্যান্য খাতের আধুনিকায়ন ও বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। এ কঠিন অথচ পরস্পর নির্ভরশীল প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে বৃহত শিল্প।

পুঁজিবাদের নিয়মানুযায়ী শিল্পায়ন শুরু হয়েছিল হালকা শিল্পের যান্ত্রিকীকরনের মাধ্যমে। এর কারণ হচ্ছে ঃ ১। হালকা শিল্পে কম পুঁজি লাগে; ২। পুঁজির আবর্তনে কম সময় লাগে। ফলে মূলধন গঠন প্রক্রিয়া দ্রুততর হয় এবং হালকা শিল্পের মেশিনসহ উৎপাদনের উপকরণের চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এ পর্যায়ে আবির্ভাব ঘটে ভারী মৌলিক শিল্পের যা ক্রমান্বয়ে নেতৃত্বদানকারী শিল্পে পরিণত হয়। শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় সকল পুঁজিবাদী দেশে দ্রুত গতিতে বিকশিত হতে থাকে মৌলিক ভারী শিল্পের।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, জার্মানীতে ১৮৬৭-১৯১৩ এ সময়ে উৎপাদনের উপকরণের (মূলধনী পণ্যের) উৎপাদন ৯ গুন বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ঐ একই সময়ে মাত্র ৪ গুণ হয়েছিল। অন্যদিকে ফ্রান্সে মৌলিক ভারী শিল্প হালকা শিল্পকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ- ষাটের দশকেই (১০)।

ঐতিহাসিকভাবে পুঁজিবাদী শিল্পায়ন অবশ্যই প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। শিল্পায়নের ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলোর অর্থনীতিতে শিল্প প্রধান খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়। অর্থনীতির আধুনিকায়ন সম্ভব হয়। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বহুগুনে বৃদ্ধি পায়। নগরায়ন বৃদ্ধি পায় এবং গড়ে উঠে বড় বড় শিল্প কেন্দ্র। অন্যদিকে পুঁজিবাদী অসম উন্নয়নের নিয়মের কারণে বৃদ্ধি পায় বৈষম্য ও দ্বন্ধ। যে কারনে আমরা দেখতে পাই যে, শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় মাত্র গুটি কয়েক দেশ শিল্পায়িত দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : গ্রেট বৃটেন (তার ডোমিনিয়ন কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিন আফ্রিকাসহ), জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, এদের সবাই কলোনীর মালিক ছিল। জোর করে অন্য দেশ দখল করে উপনিবেশ বানিয়েছিল। উপনিবেশগুলোকে তারা মেট্রোপলির বিকাশমান শিল্পের বাজার ও কাঁচামালের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, এগুলো লুণ্ঠনের মাধ্যমে তারা মেট্রোপলির সঞ্চয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবেই উপরোক্ত দেশগুলো নিজেদের দেশকে শিল্পায়িত করতে সক্ষম হয়েছিল। আর এশিয়া, আফ্রিকা ও লেটিন আমেরিকাসহ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে অবস্থিত তাদের কলোনীগুলো মেট্রোপলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং কৃষিজাত পণ্য ও খনিজসম্পদের যোগানদাতায় পরিণত হয়। শিল্পায়িত দেশগুলোর শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী নিয়মেই অসমতা ও বৈষম্য দেখা দিয়েছিল। গুটিকয়েক সাম্রাজ্যবাদী দেশ বিশেষ কতগুলো শিল্পে একচেটিয়া শক্তিধর দেশে পরিণত হয় এবং বিশ্বের শিল্পোৎপাদনের সিংহভাগ তাদের নিয়ন্ত্রনে রাখতে সক্ষম হয়। উদাহরণ হিসেবে চারটি দেশের কথা বলা যায় ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৫-৪৫) প্রাক্কালে পুঁজিবাদী বিশ্বের শিল্পোৎপাদনের ৭০% এরও বেশী উৎপাদন করতো অথচ পুঁজিবাদী বিশ্বে তাদের সম্মিলিত আয়তন ও লোকসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮% ও ১৫% মাত্র (১০)। এদের সাথে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে জাপান। শিল্পায়িত এ শক্তিধর পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে চলছে অব্যাহত প্রতিযোগিতা যার ধারাবাহিকতায় পুঁজিবাদী বিশ্ব এখন মূলতঃ তিনটি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে ঃ জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এদের মধ্যে চলছে এক অঘোষিত বানিজ্য যুদ্ধ। পুঁজিবাদী শিল্পায়নের এ এক অনিবার্য পরিণতি।

অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ঘটেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। পুঁজিবাদী শিল্পায়ন হয়েছে ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে, ব্যক্তিগত মালিকানায়। আর সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ঘটেছে সামাজিক মালিকানায়, রাষ্ট্রীয় উদ্দ্যোগে। ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর (খৃষ্টীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৭ই নভেম্বর) রাশিয়ায় প্রথম সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়। জন্মলগ্ন থেকেই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করতে থাকে। এমন কি এক পর্যায়ে বিপ্লবের মাত্র ৬ মাসের মাথায় তারা ঐ দেশটিকে আক্রমন করে এবং তিন চতুর্থাংশ দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শক্তির সামনে তারা টিকতে পারে নি। ১৯২০ সাল নাগাদ তাদেরকে ঝেটিয়ে বিদায় করেছিল তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন। এর পরও তারা নানাভাবে সমাজতন্ত্রের যাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে থাকে।

এরকম এক কঠিন বৈরী পরিবেশে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন শুরু হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। এ

শিল্পায়ন ছিল সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব সম্পদ নির্ভর। সমাজতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী তারা মৌলিক ভারী শিল্পের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিল। কারণ মৌলিক ভারী শিল্প সমাজতন্ত্র তথা অর্থনীতির ভিত্তি নির্মানে সাহায্য করে। লেনিনের ভাষায়, “বৃহত মেশিন শিল্প এবং কৃষিতে তার ট্রান্সফারই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি, পুঁজির জোয়াল থেকে মানবতাকে রক্ষা করার সফল সংগ্রামের একমাত্র উপায়” (১০)। পুঁজিবাদে শিল্পায়ন ঘটে অপরিকল্পিতভাবে, আর সমাজতন্ত্রে পরিকল্পিতভাবে। দেশকে শত্রুমুক্ত করার সাথে সাথেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯২০ সালে প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা - গোত্রলরো পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এটা ছিল ১০ থেকে ২০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা যাতে মৌলিক ভারী শিল্পের উপর বিশেষ করে সমগ্র দেশের বিদ্যুতায়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এ জন্যে এ পরিকল্পনাকে বিদ্যুতায়নের পরিকল্পনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থনীতিতে বিদ্যুতের গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন সাম্যবাদকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, “সাম্যবাদ হচ্ছে সোভিয়েত (পরিষদ) ধাঁচের শাসনব্যবস্থা ও সমস্ত দেশের বিদ্যুতায়ন” (১২)।

এ পরিকল্পনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩০টি বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। আর এটা বাস্তবায়ন করতে গিয়েই গড়ে তুলতে হয়েছিল অন্যান্য সব মৌলিক ভারী শিল্প ঃ খনিজ পদার্থ উত্তোলনের শিল্প (কয়লা, আকরিক লৌহ, অন্যান্য খনিজ ধাতব পদার্থ, তেল ও গ্যাস), লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, যন্ত্রপাতি শিল্প ইত্যাদি। আর এগুলোর উপর ভিত্তি করেই বিকশিত হয়েছিল অর্থনীতির অন্যান্য খাত ও উপখাতগুলো। এ পরিকল্পনা মূলত ঃ বাস্তবায়িত হয়েছিল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে। কিন্তু পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা শুরু করতে সোভিয়েত ইউনিয়নে বেশ দেরী হয়েছিল। কারণ প্রায় গোটা বিশ্বের দশকটি আভ্যন্তরীন প্রতিবিপ্লবী ও বহিঃশত্রুর ধবংসাত্মক কর্মকান্ড মোকাবেলায় ব্যতিব্যাস্ত থাকতে হয়েছিল। ১৯২৮ সালে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয় যার মেয়াদ ছিল ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত। এটা ছিল ঐ সময় যখন গোটা পুঁজিবাদী বিশ্ব ইতিহাসের মহাসংকটে নিমজ্জিত ছিল (মহামন্দা)। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন সংকটমুক্ত পরিবেশে অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। মাত্র সোয়া চার বছরে তারা এ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা শুধু বাস্তবায়নই করে নি, কয়েকগুনে অতিক্রম করে গিয়েছিল। যেকারণে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করে ১৯৩৩ সালে। এ পরিকল্পনার মেয়াদকাল ছিল ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত।

প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকালে ১,৫০০টি বৃহত শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মান করা হয় যার বেশির ভাগই ছিল মৌলিক ভারী শিল্প। এ পরিকল্পনার শেষে দেশের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুন হয়েছিল এবং উৎপাদনের উপকরণের উৎপাদন প্রায় তিনগুন হয়েছিল (২.৭ গুন)। শিল্পোৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৯.২%, আর গ্রুপ - এ - ২৮.৫%। অপরদিকে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রতিষ্ঠা করা হয় ৪,৫০০ বৃহত শিল্প কারখানা। এ পরিকল্পনাকালে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২.২ গুন হয়, আর গ্রুপ-এ- ২.৪ গুন। বিদ্যুতের উৎপাদন প্রায় তিনগুন (২.৭) বৃদ্ধি পায়। সম্পন্ন হয় গোত্রলরো পরিকল্পনার বাস্তবায়নের কাজ। দেশে ৩০টির স্থলে ৪২টি বৃহত বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মান করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন আবির্ভূত হয় একটি শিল্পায়িত দেশ হিসেবে। সারা বিশ্বের শিল্পোৎপাদনে সে ১৯১৩ সালের ৫ম স্থান থেকে ২য় স্থানে উঠে আসে (যুক্তরাষ্ট্র ছিল ১ম স্থানে)। অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পূর্ণ হয়। অর্থনীতির কাঠামোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় ঃ শিল্পের অংশ দাঁড়ায় ৭৭.৪%, আর কৃষির- ২২.৬% (১০, ২)।

চীনসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর শিল্পায়নে অনেক কম সময় লেগেছে। কারণ পুঁজিবাদী

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বিরোধীতার মুখে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সার্বিক সহায়তা পেয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পায়নে (শিল্প বিপ্লব) যেখানে দু'দশক সময় লেগেছিল, চীনসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সেখানে মাত্র এক দশকের মত সময় লেগেছিল। আর পুঁজিবাদী দেশগুলোতে লেগেছিল ১০০ থেকে ২০০ বছরের মত (১০, ২)।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্পায়ন অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু শত শত বছরের ঐপনিবেশিক শাসন ও শোষনের ফলে তাদের অর্থনীতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে গিয়েছে। একদিকে সম্পদের অপ্রতুলতা, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অনুসৃত নব্য সাম্রাজ্যবাদী নীতির কারণে এ সকল দেশের শিল্পায়নসহ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের প্রচেষ্টা পদে পদে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই এ সকল দেশের সমস্যা অনেক। কর্মসংস্থানের সমস্যা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের সমস্যা, সঞ্চয়ের স্বল্পতা, আবাসনের সমস্যা, খাদ্য সমস্যা ইত্যাদি। এমতাবস্থায় এ সকল দেশের দ্রুত শিল্পায়ন আবশ্যক। আর সেজন্য প্রয়োজন উন্নত দেশেসমূহের সাহায্য-সহযোগিতা। এ ক্ষেত্রে তারা দু'দিক থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছেঃ উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছ থেকে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছ থেকে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলো (বিশ্ব ব্যাংক, আই এম এফ, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদি) সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে নানা শর্ত জুরে দেয়। তারা নিজেদের দেশের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ বিবেচনায় রেখে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে থাকে। নিকট অতীতের উপনিবেশগুলোকে ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের প্রভাব বলয়ে ধরে রাখা, তাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা এবং এদেশগুলোকে বাজার হিসেবে ব্যবহার করা- এসবই হচ্ছে তথাকথিত সাহায্য- সহযোগিতার মূল উদ্দ্যেশ্য। আর তাই তো আমরা দেখতে পাই যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও সংস্থাগুলোর সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন দেশ আত্মনির্ভরশীল হতে পারেনি, পারেনি নিজের দেশকে শিল্পায়িত করতে।

সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যের টোপ গিলে এ সকল দেশগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে বিশাল ঋণের বোঝায় জর্জড়িত। ঋণের সুদ পরিশোধ করতেই তাদের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ খরচ করতে হচ্ছে। শিল্পায়ন তাদের জন্য স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। এ সকল দেশের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে ব্রাজিল, চিলি, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ। ব্যতিক্রম শুধু গুটি কয়েক জাতীয়তাবাদী দেশ ঃ ভারত, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর ও মেক্সিকো। এ দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের রক্ত চক্ষুকে ভ্রুকুটি করে মোটামুটি একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করেছে। যে কারণে তারা শুধু তাদের দেশকে শিল্পায়িতই করতে পারে নি, দেশকে আত্মনির্ভরশীল করতে পেরেছে। অন্যদিকে দু'টি দেশ ঃ তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ার কথাই আলাদা। তারা জামাই আদর পাচ্ছে সম্রাজ্যবাদীদের কাছে। কারণ সমাজতান্ত্রিক চীন ও উত্তর কোরিয়ার সীমান্তে তাদের অবস্থান। মূলতঃ এ দেশ দু'টো পুঁজিবাদী শোকেস। সাম্রাজ্যবাদীদের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট এ দেশ দু'টোতে অসংখ্য সামরিক ঘাটি স্থাপন করে শোকেস পাহাড়া দিচ্ছে। ফলে এ দেশ দু'টোর সার্বভৌমত্ব আছে এ কথা বলা যায় না। তাইওয়ানকে তো আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্র স্বীকৃতিই দেয় নি। পূর্ব এশিয়ার সংকটে (১৯৯৮ সালে) সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়াঃ দু'টো দেশই সাম্রাজ্যবাদীদের মদদপুষ্ট, সাহায্যপুষ্ট দেশ। আর সেকারণে সংকট উত্তরনে সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলো তাদেরকে ছাপ্পড় ফেরে সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছিল (৬০-৭০ বিলিয়ন ডলার প্রতিটিকে)। এটা সংকট যার চির সঙ্গী সেই পুঁজিবাদের শ্রেষ্টত্ব প্রমানের একটা ব্যর্থ প্রয়াস আর কি। অথচ বাংলাদেশের মত দেশকে ঋণ দিতে ঐ একই প্রতিষ্ঠানগুলো জুরে দিয়েছে কঠিন শর্তঃ একমাত্র জ্বালানী সম্পদ (যা তার নিজের চাহিদা পুরনেই যথেষ্ট নয়) গ্যাস

রপ্তানী করতে হবে।

অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো যে সকল দেশকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে তারা সবাই হয় আত্মনির্ভশীল হয়েছে, না হয় তা অর্জনের পথে রয়েছে। কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সহায্য শর্তমুক্ত এবং আত্মনির্ভরশীতা অর্জনের সহায়ক। ভারত, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া. সিরিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া, মিশর ও ইরাক এদের মধ্যে অন্যতম। এ দেশগুলো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সহযোগিতায় দেশে শিল্পের মজবুত ভিত্তি তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে যা দেশগুলোকে আত্মনির্ভরশীলতার দিকে বহুদুর এগিয়ে দিয়েছে। ভারত তো এখন দস্তুরমত একটি শক্তিধর বিশ্ব শিল্প শক্তিতে পরিণত হয়েছে। মোট শিল্পোৎপাদনে পুঁজিবাদী বিশ্বে তার অবস্থান এখন ১০ এর মধ্যে (১৫)।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ দু'বার ঐপনিবেশিক শাসন ও শোষনের শিকার হয়েছিল। বৃটিশ সাম্রাজবাদীরা তাদের নিকট অতীতের উপনিবেশগুলোকে তাদের প্রভাব বলয়ে ধরে রাখার জন্য গঠন করেছিল 'কমনওয়েলথ' নামের একটি সংস্থা। বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকেই এর সদস্য। এ ছাড়াও বাংলাদেশ আরও অনেক এরকম সংস্থার সদস্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ তার অর্থনীতিতে শিল্পায়নের ভিত্তি তৈরী করতে পারেনি। আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন তো সুদূরপরাহত। প্রবন্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাই বাংলাদেশের শিল্পায়ন নিয়ে আলোচনা করবো।

বাংলাদেশের শিল্পায়নের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে শিল্পায়নের কোনও বিকল্প নেই। অথচ স্বাধীনতার ৩৩ বছরেও বাংলাদেশ শিল্পায়নের তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি তৈরী করতে পারে নি। আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের কাঠামোর দিকে তাকালেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়

সারণী-১

বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পের অংশ, ১৯৯২-২০০১ সময়ে (১৯৯৫-৯৬ সালের মূল্যে)

%

খাতসমূহ	বছর								
	১৯৯২ ৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১। শিল্প ঃ									
যার মধ্যে ঃ	১৩.৮	১৪.৪	১৫.২	১৫.৪	১৫.৪	১৫.৯	১৫.৬	১৫.৪	১৫.৮
(ক) বৃহৎ শিল্প ঃ	৯.৮	১০.২	১০.৯	১১.০	১০.৯	১১.৩	১১.২	১১.০	১১.৪
(খ) ক্ষুদ্র শিল্প ঃ	৪.০	৪.১	৪.৩	৪.০	৪.৫	৪.৬	৪.৪	৪.৪	৪.৪
২। কৃষি ঃ	২৩.৩	২২.২	২০.৮	২০.৩	২০.৪	১৯.৭	১৯.৪	১৯.৫	১৯.১
৩। নির্মান ঃ	৬.০	৬.৩	৬.৬	৬.৯	৭.১	৭.৪	৭.৭	৭.৮	৮.০
মোট (১+২+৩)	৪৩.১	৪২.৯	৪২.৬	৪২.৬	৪২.৯	৪৩.০	৪২.৭	৪২.৭	৪২.৯
৪। অন্যান্য ঃ	৫৬.৯	৫৭.১	৫৭.৪	৫৭.৪	৫৭.১	৫৭.০	৫৭.৩	৫৭.৩	৫৭.১
সর্বমোট ঃ (১+২+৩+৪) ঃ	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস ঃ ১৪, পৃঃ ৪৫০ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

(সারণী-১)। সারণী-১ এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত এক দশকে মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পের অংশ প্রায় একই রয়েছে- ১৯৯২-৯৩ সালের ১৩.৮% থেকে ২০০০-২০০১ সালে ১৫.৮% এ উন্নীত হয়েছে। ঐ একই সময়ে কৃষির অংশ প্রায় ৪% হ্রাস পেয়েছে- ১৯৯২-৯৩ সালের ২৩.৩% থেকে ২০০০-২০০১ সালে গিয়ে ১৯.১% এ ঠেকেছে। অর্থাৎ কৃষির অংশ হ্রাসের অনুরূপ শিল্পের অংশ বাড়ে নি, বেড়েছে অন্যান্য খাতের অংশ যেগুলো মূলতঃ অনুৎপাদনশীল খাত অথবা সরাসরি বস্তুগত উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এটার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত কাঠামোগত পরিবর্তন আসছে না- দেশের শিল্পায়ন হচ্ছে না।

শিল্পায়নের তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভীত হচ্ছে মৌলিক ভারী শিল্প (গ্রুপ-এ)। আর এ মৌলিক ভারী শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেই বললেই চলে (সারণী-২)। সারণী-২ এর তথ্য সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে গ্রুপ এ জাতীয় শিল্পের অর্থাৎ মৌলিক ভারী শিল্পের অংশ উল্লেখ করার মত নয় এবং বিগত দশকে এর অংশ কার্যত: স্থির ছিল- ১৯৯১-৯২ সালের ২.৫% থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে ১৯৯৯-২০০০ সালে ২.৩%-এ গিয়ে ঠেকেছে। এখননে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মৌলিক ভারী শিল্প হচ্ছে সেই ধরনের শিল্প যেগুলোর বিকাশ শিল্প তথা গোটা অর্থনীতির ভিত্তি তৈরী করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুত, খনিজ উত্তোলন, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, রসায়ন ইত্যাদি।

সারণী-২

গ্রুপ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদন, ১৯৯১-২০০০ সময়ে (১৯৯৫-৯৬ সালের মূল্যে)*

বিঃ টাকা ও % **

পণ্যের গ্রুপ	বছর								
	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯ ২০০০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১। গ্রুপ-এ	৩৩.৫ (২.৫)	৩৪.৫ (২.৪)	৩৫.৬ (২.৪)	৩৮.১ (২.৪)	৩৯.৫ (২.৪)	৪২.৪ (২.৪)	৪৪.০ (২.৪)	৪৭.৪ (২.৫)	৪৬.৮ (২.৩)
২। গ্রুপ-বি	১৩৫৮.৫ (৯৭.৫)	১৪২১.২ (৯৭.৬)	১৪৭৯.৫ (৯৭.৬)	১৫৫১.৭ (৯৭.৬)	১৫৯৩.৭ (৯৭.৬)	১৭১০.৫ (৯৭.৬)	১৮০০.৪ (৯৭.৬)	১৮৮৬.৯ (৯৭.৫)	২০০২.৫ (৯৭.৭)
মোট ঃ	১৩৯২.০ (১০০.০)	১৪৫৫.৭ (১০০.০)	১৫১৫.১ (১০০.০)	১৫৮৯.৮ (১০০.০)	১৬৬৩.২ (১০০.০)	১৭৫২.৯ (১০০.০)	১৮৪৪.৪ (১০০.০)	১৯৩৪.৩ (১০০.০)	২০৪৯.৩ (১০০.০)

* উৎপাদিত সকল পণ্য ও সেবাকে দু'টি বৃহৎ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ-এ হচ্ছে মূলধনী পণ্য বা উৎপাদনের উপকরণ এবং গ্রুপ-বি হচ্ছে ভোগ্য পণ্য ও সেবা। গ্রুপ-এ এর মধ্যে লৌহ, ইস্পাত, বিদ্যুত, গ্যাস, যন্ত্রপাতি, ধাতব পদার্থ (লৌহ ও ইস্পাত ব্যতীত) ও রাসায়নিক দ্রব্যকে ধরা হয়েছে। ** বন্ধনীর ভেতরের অংকগুলো দ্বারা অংশ বোঝানো হয়েছে।

উৎস ঃ ১৪ পৃঃ ৪৫০ - ৫৪ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

মৌলিক ভারী শিল্পের বিকাশ না ঘটার ফলে দেশের শিল্পায়নের জন্যে গ্রুপ-এ জাতীয় পণ্যের অর্থাৎ মূলধনী পণ্যের চাহিদার প্রায় সবটাই বর্তমানে আমদানী করতে হচ্ছে (সারণী-৩)। সারণী-৩ এর তথ্য বলছে যে, আমাদের দেশের আমদানী বিলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে মূলধনী পণ্য অর্থাৎ গ্রুপ-এ জাতীয় পণ্য আমদানীর ব্যয়। লক্ষ্যনীয় যে, বিগত প্রায় এক দশকে অবস্থার আরও

অবনতি হয়েছে। অর্থাৎ গ্রুপ-এ জাতীয় পণ্য আমদানীর অংশ ১৯৯৪ সনের ৩১.০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৮.০% এ।

সারণী-৩

গ্রুপ ভিত্তিক বাংলাদেশের আমদানী পণ্যের বিবরণ, ১৯৯৪ - ২০০০ সময়ে

বিঃ টাকা ও % *

পণ্যের গ্রুপ	বছর					
	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। গ্রুপ-এ	৬৮.২	৮৯.৪	১২০.১	১২০.৩	১২১.৬	১৪০.০
	(৩১.০)	(৩৫.০)	(৪১.০)	(৩৮.০)	(৩৬.০)	(৩৮.০)
২। গ্রুপ-বি	১৫০.৪	১৬৫.৩	১৭০.১	১৯৮.৬	২১৯.৪	২৩২.০
	(৬৯.০)	(৬৫.০)	(৫৯.০)	(৬২.০)	(৬৪.০)	(৬২.০)
মোট ঃ	২১৮.৬	২৫৪.৭	২৯০.২	৩১৮.৯	৩৪১.০	৩৭২.০
	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)

* বন্ধনীর ভেতরের অংকগুলো দ্বারা অংশ বোঝানো হয়েছে।

উৎস ঃ ১৪ পৃঃ ২৮১ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

সারণী-৪

গ্রুপ ভিত্তিক বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের বিবরণ, ১৯৯৪ - ২০০০ সময়ে

বিঃ টাকা ও % *

পণ্যের গ্রুপ	বছর					
	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। গ্রুপ-এ	৭.১	৬.১	৭.৪	৫.৯	৬.৪	৭.২
	(৫.০)	(৪.০)	(৪.০)	(৩.০)	(৩.০)	(৩.০)
২। গ্রুপ-বি	১২৯.৯	১৩৮.৪	১৬৪.২	২২৩.৫	২৩৯.২	২৪০.২
	(৯৫.০)	(৯৬.০)	(৯৬.০)	(৯৭.০)	(৯৭.০)	(৯৭.০)
মোট ঃ	১৩৭.০	১৪৪.৫	১৭১.৬	২২৯.৪	২৪৫.৬	২৪৭.৪
	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)

* বন্ধনীর ভেতরের অংকগুলো দ্বারা অংশ বোঝানো হয়েছে।

উৎস ঃ ১৪ পৃঃ ২৮০ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত ।

সারণী-৫

নির্বাচিত কয়েকটি দেশের শিল্প কাঠামো (গ্রুপভিত্তিক), ১৯৯০ - ২০০০ সময়ে

অংশ, %

শিল্পজাত	বাংলাদেশ		ভারত		চীন		মালয়েশিয়া		পাকিস্তান	
পণ্যের গ্রুপ	১৯৯০	২০০০	১৯৯০	২০০০	১৯৯০	২০০০	১৯৯০	২০০০	১৯৯০	২০০০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। গ্রুপ-এ	২৩.০	২৬.০	৩৯.০	৪৭.০	৩৭.০	৪১.০	৪২.০	৫৪.০	২৪.০	১২.০
২। গ্রুপ-বি	৭৭.০	৭৪.০	৬১.০	৫৩.০	৬৩.০	৫৯.০	৫৮.০	৪৬.০	৭৬.০	৮৮.০
মোট ঃ	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস ঃ ১৫ পৃঃ ১৯৪ - ৯৫ এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে হিসেবকৃত ।

আর গ্রুপ-এ জাতীয় পণ্য আমরা খুবই সামান্য পরিমান রপ্তানী করছি (সারণী-৪) । সারণী-৪ এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৯০-এর দশকে এ ক্ষেত্রে অবস্থার অবনতি হয়েছে । অন্য কথায় বলা যায় যে, ১৯৯৪ সালে যেখানে গোটা রপ্তানী আয়ের ৫.০% অর্জিত হয়েছিল গ্রুপ-এ জাতীয় পণ্য রপ্তানী থেকে ২০০০ সাল নাগাদ তা প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে (৩.০%) । এর মানে হচ্ছে এই যে, আমরা যা উৎপন্ন করি (মূলধনী পণ্য) তার বাজার নেই অথবা অত্যন্ত সীমিত ।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো কেমন তা আরও পরিস্কারভাবে অনুধাবনের জন্যে আমরা এশিয়ারই এবং আমাদের প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের শিল্প কাঠামোর সাথে আমাদের দেশের শিল্প কাঠামোর তুলনা করার প্রয়াস নিয়েছি এ প্রবন্ধে (সারণী-৫) । সারণী-৫ এর তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, তুলনাভুক্ত ৫টি দেশের মধ্যে ৩টি দেশেরই শিল্প কাঠামোতে গ্রুপ-এ জাতীয় পণ্যের অংশ ৪০-এর কোঠায়, মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে এমন কি পঞ্চাশের কোঠায় উঠে এসেছে । আর বাকী দু'টোর ক্ষেত্রে তা বিশের কোঠায় দাঁড়িয়ে আছে, যদিও পাকিস্তানের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ । লক্ষ্যনীয় যে, ৯০-এর দশকে পাকিস্তান ছাড়া অন্য চারটি দেশের ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যতসামান্যই উন্নতি হয়েছে - ১৯৯০-এর ২৩.০% থেকে ২০০০-এ ২৬.০%-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে । ভারত, চীন ও মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ৩৯.০% থেকে ৪৭.০%, ৩৭.০% থেকে ৪১.০% এবং ৪২.০% থেকে ৫৪.০% । আর পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হয়েছে অবনতি অর্থাৎ ১৯৯০-এর ২৪.০% থেকে হ্রাস পেয়ে অর্ধেকে নেমে গেছে (১২.০%) ।

আমাদের উপরোক্ত বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৩ বছরেও বাংলাদেশ শিল্পের শক্ত ভিত তৈরী করতে পারে নি । কি কি কারণে এটা সম্ভব হয় নি নিম্নে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করবো ।

শিল্পায়নের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে ***ভ্রান্ত শিল্প নীতি*** । দেশের আত্মনির্ভরশীলতাকে ধারণ করে এরকম একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পনীতি আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের দেশের সরকারগুলোর কাছ থেকে পাই নি । পঁচাত্তর পূর্ববর্তী সরকার অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর সরকার অবশ্য কিছু সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ

নিয়েছিলেন। এ সময়েই গড়ে উঠেছিল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ভারী শিল্প- চট্টগ্রাম ষ্টীল মিল, জেনারেল ইলেক্ট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাক্চারিং কারখানা, ঘোড়াশাল বিদ্যুত উৎপাদান কারখানা, খুলনা শিপইয়ার্ড, জয়দেবপুর মেশিনটুল ইন্ডাষ্ট্রি প্রভৃতি। যদিও এগুলোর পরিকল্পনা ৬০-এর দশকে নেয়া হয়েছিল, বাস্তবায়ন মোটামুটিভাবে বঙ্গবন্ধুর আমলে হয়েছিল। ব্যবস্থাপনাগত অদক্ষতা সত্ত্বেও ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এগুলো লাভজনকই ছিল। ৬০-এর দশকে গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশের পাট ও বস্ত্র শিল্পের কারখানা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এগুলোর বেশীরভাগের মালিক ছিল পাকিস্তানীরা। স্বাধীনতা যুদ্ধের আশা-আকাংখাকে ধারণ করে ১৯৭২ সালের ৪-ঠা নভেম্বর জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত প্রথম সংবিধানে বাংলাদেশের ৪টি জাতীয় লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়। এগুলো হচ্ছে ঃ বাঙালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। এ লক্ষ্যগুলোর বাস্তবায়নের জন্যেই ১৯৭২ সালে বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ করা হয়েছিল। পাকিস্তানীরা বাংলাদেশ থেকে বিতারিত হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় লুট-পাট চালিয়েছিল এবং পুড়িয়ে দিয়ে ধ্বংস স্তুপ রেখে গিয়েছিল। এর উপর ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি। অভাব ছিল দক্ষ জনশক্তির। এ রকম এক বৈরী পরিবেশের সুযোগ নিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজিবাদী চক্র ও ১৯৭১-এর পরাজিত শত্রুরা। এদের সম্মিলিত ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের ফলে দেশের পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। এমতাবস্থায়, বঙ্গবন্ধু শত্রুর হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্যে এবং দেশের অর্থনেতিক মুক্তির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন। পরিবর্তন আনা হয় দেশের শাসন ব্যবস্থায়। চালু করা হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা। গঠন করা হয় ৬৪টি বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক অঞ্চল (পুরাতন মহাকুমাগুলোকে নিয়ে) যার প্রত্যেকটিতে একজন গভর্নর নিয়োগ দেয়া হয়। এগুলোর প্রশাসন হবে নির্বাচিত, তবে প্রথমবারের মত সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। কৃষির আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ১২৫টি থানায় (বর্তমানের উপজেলায়) বহুমুখী সমবায় গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। শিল্পের আধুনিকায়ন ও আরও মৌলিক ভারী শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা বঙ্গবন্ধুর সরকারের ছিল। বিদ্যুতের সমস্যা সমাধানের জন্যে রূপপুরে পারমানবিক বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্র একাত্তরের পরাজিত শক্তির সহযোগিতায় পঁচাত্তরের ১৫-ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং নির্মমভাবে স্বপরিবারে তাঁকে হত্যা করে।

কয়েক দফা ক্যু পাল্টা ক্যু এর মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন জেনারেল জিয়া। মাথা চারা দিয়ে ওঠে স্বাধীনতার শত্রুরা। সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও সংস্থাগুলো। শুরু হয় বাংলাদেশে তাদের নিল নকশা বাস্তবায়নের কাজ। সর্বাগ্রে আঘাত করা হয় জাতীয়করণকৃত শিল্পখাতের উপর। লক্ষ্যনীয় বিষয় ছিল এই যে, প্রচার চালানো হয়েছে রাষ্ট্রীয় খাতের লোকশান দেয়ার কথা, আর বেসরকারীকরণ করা হয়েছে সকল লাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহ। লোকশানী প্রতিষ্ঠানসমূহ হয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, না হয় লোকশানী হিসেবেই চালানো হয়েছে। উপরন্তু পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো এমনকি লোকশানী প্রতিষ্ঠানগুলোতেও নিয়োগ দিয়েই গেছে। এভাবে লোকশান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। লালবাতি জ্বালিয়েছে এ সকল প্রতিষ্ঠানে। উদাহরণ স্বরূপ চট্টগ্রাম ষ্টীল মিল, জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী, খুলনা শিপইয়ার্ড, জয়দেবপুর মেশিনটুল ইন্ডাষ্ট্রি ও আদমজী পাটকলের নাম উল্লেখ করা যায়।

পঁচাত্তর পরবর্তী সরকার প্রধানরা ঘন ঘন দুটো দেশ সফর করতেন ঃ একটা হচ্ছে সৌদি আরব (রিয়াদ), আর অন্যটি হচ্ছে চীন (বেইজিং)। রিয়াদ যেতেন ধর্মীয় এবং মানুষ রপ্তানীর উদ্দেশ্যে।

বেইজিং যেতেন শেখার জন্যে কিভাবে চীনারা তাদের দেশকে শিল্পায়িত করেছে এবং এত মানুষকে কাজ দিতে পেরেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, চীনারা পঞ্চাশের দশকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্যন্ত সফলতার সহিত স্থানীয় কাঁচামাল ভিত্তিক হাজার হাজার শিল্পকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে জেনারেল রাষ্ট্রপতি জিয়াও বাংলাদেশে শিল্প নগরী গড়ে তোলার এক প্রকল্প হাতে নেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় এ উদ্দেশ্যে হুকুম দখল করা হয় লক্ষ লক্ষ একর কৃষি জমি। পরবর্তী জেনারেল রাষ্ট্রপতি এরশাদ সাহেবও অব্যাহত রাখেন এ প্রক্রিয়া। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুই জেনারেল রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা দখল করে রাজনীতি শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে দল ও পার্টি গঠন করেন। শিল্প নগরীর নামে হুকুম-দখলকৃত জমিতে গড়া প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অর্থনীতির চেয়ে প্রাধান্য পায় রাজনীতি (দল, পার্টি)। শিল্পায়নের নামে সরকারী খাতের ব্যাংকগুলোর বিপুল পরিমান টাকা হয় লুট-পাট, আত্মসাত। বিরাষ্ট্রীয়করণের ক্ষেত্রেও অর্থনীতির চেয়ে রাজনীতি প্রাধান্য পেয়েছে। লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো পানির দামে বিক্রি করা হয়েছে এবং ক্রয়ের জন্যে ঋণও দেয়া হয়েছে সরকারী খাতের ব্যাংকগুলো থেকে। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বেসরকারী মালিকরা সরকারী খাতের কারখানাগুলো নিয়ে লাভজনকভাবে চালাতে তো পারেই নি, সরকারের পাওনাও অনেক ক্ষেত্রে পরিশোধ করে নি। ফলে সেগুলো আবার ফেরত নেয়া হয়-এ রকম ঘটনাও ঘটেছে। অর্থাৎ বেসরকারী করণের ফলে দেশের অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে। প্রথমত ঃ প্রকৃত দামের চেয়ে কম দামে বিক্রয়ের ফলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়েছে। দ্বিতীয়ত ঃ সরকারী ব্যাংকের ঋণে ক্রয় করে উদ্দ্যেক্তারা সে ঋণ ফেরত দেয় নি, খেলাপী হয়েছে। যার ফলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়েছে। তৃতীয়ত ঃ দক্ষতার নামে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকুরী চ্যুত করা হয়েছে যার ফলে সমাজে অশান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। চতুর্থত ঃ বেসরকারী মালিকরা সরকারের কর ও শুল্ক ফাঁকি দিয়েছে যার ফলে সরকারের রাজস্ব আয় হ্রাস পেয়েছে। পঞ্চমত ঃ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে দেশের ক্ষতি হয়েছে। ষষ্ঠত ঃ বেসরকারী উদ্দ্যেক্তারা কর ও শুল্ক রেয়াত পেয়েছে। এর ফলেও সরকারের রাজস্ব আয় হ্রাস পেয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সরকারী খাতে লোকসান হলেও তা বেসরকারী খাতকে প্রদত্ত সকল রেয়াত ও সুযোগ-সুবিধার ফলে সৃষ্ট সম্মিলিত ক্ষতির চেয়ে কমই হতো।

সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও সংস্থাসমূহের নির্দেশ-পরামর্শে আমাদের দেশের পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো একচোখা শিল্পনীতি অনুসরণ করেছে। ব্যক্তিগত খাতের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং সরকারী খাতকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। দক্ষ উদ্দ্যেক্তার অভাবের এ দেশে তাই যা হবার তাই-ই হয়েছে-শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে মারাত্মকভাবে।

সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে শুরু হয় পোষাক শিল্পের বিকাশ। কিন্তু এ শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মেশিন ও কাঁচামালের জন্যে আমদানির উপর নির্ভর করতে হয়েছে এবং অদ্যাবধি তা বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ এ শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় পশ্চাতসংযোগ শিল্প গড়ে তোলার কোনও পরিকল্পনা সরকারের ছিল না। কর ও শুল্ক রেয়াতসহ এ শিল্পের মালিকরা ভোগ করছে অবাধ সুযোগ-সুবিধা। এমন কি তথাকথিত রপ্তানি ইনসেনটিভের নামে প্রতি বাজেটে তাদের জন্যে রাখা হয়েছে শত শত কোটি টাকার ভর্তুকী। এ খাতের জন্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলারও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। ফলে এ খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে বিদেশী জনশক্তি। বর্তমানে প্রায় ৩০-৪০ হাজার বিদেশী নাগরিক এ শিল্পে নিয়োজিত আছে (১৮, ১৯)। এর উপরে রয়েছে শুল্ক সুবিধার অপব্যবহার, অর্থাৎ পোষাক শিল্পের মালিকরা প্রয়োজনাতিরিক্ত কাঁচামাল বিশেষ করে কাপড় আমদানি করে কালো বাজারে বিক্রি করে

মুনাফা করছে। এর ফল হচ্ছে ভয়াবহ ঃ দেশের প্রধান শিল্প বস্ত্র শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, পোষাক শিল্পের আমদানি বিল পরিশোধে এর আয়ের ৭০% এরও বেশী ব্যয় হচ্ছে (৬)। সুতরাং এখাতে মূল্য সংযোজন প্রকৃত হিসেবে খুবই কম। কাজেই এ খাতের মূল অবদান হচ্ছে পানির দামে মহিলা শ্রম শোষন। আর কোটা প্রথা রহিত হলে এ খাতের যে কি অবস্থা হবে তা ভাবলে শংকিতই হতে হয়। ইতোমধ্যেই শোনা যাচ্ছে যে, এ খাতের প্রায় অর্ধেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে (১৮, ১৯)।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ***ভ্রান্ড় রাজস্ব নীতি***। উদার আমদানি নীতি, পরোক্ষ করের উপর অতি নির্ভরশীলতা (রাজস্ব আয়ের প্রায় ৮০%-৯০%), দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ নীতির অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে দেশীয় বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে না, দেশী পণ্য বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। ফলে সার্বিকভাবে শিল্পায়ন ব্যাহত হচ্ছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হচ্ছে ***সুষ্ঠু ব্যাংকিং নীতির অনুপস্থিতি***। শিল্পায়নের জন্যে যেরকম ব্যাংকিং নীতি অনুসরণ করা দরকার সেরকমটা আমাদের দেশে কখনই ছিল না। এমনও হয়েছে যে, মানুষ ঋণ নিয়ে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে লাভবান হয়েছে (প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্রে সুদের হার ২০% এর বেশী ছিল দীর্ঘ দিন)। ব্যাংকিং সেবা, ঋণের তদারকি ইত্যাদি ব্যাংকিং কর্মকান্ডগুলো এখনও আমলাতান্ত্রিক ও সেকেলে ধরনের রয়ে গেছে। এর উপরে রয়েছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও ইউনিয়নের দৌরাত্য বিশেষ করে সামরিক শাসকদের আমলে ব্যাংকগুলোর কর্মকান্ডে হরহামেশা হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। রাজনৈতিক, সামরিক ও ইউনিয়নের হস্তক্ষেপে ঋণ দেয়া হয়েছে, নেয়া হয়েছে। ফলে তথাকথিত শিল্প নগরীতে প্লট কেনা হয়েছে ঠিকই কিন্তু শিল্প গড়ে ওঠে নি। অনেক ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাকেও খুঁজে পাওয়া যায় নি। এভাবে শিল্পায়নের বদলে গড়ে উঠেছে বিশাল এক ঋণ খেলাপী সংস্কৃতির। খেলাপী ঋণের পরিমান বর্তমানে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা (১৮, ১৯)। এ টাকা এখন ক্রমান্বয়ে অবলেপন করা হচ্ছে। এ বিশাল অংকের টাকার সিংহভাগই হচ্ছে সরকারী খাতের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের টাকা। সরকার নিজে এ টাকা শিল্পায়নে বিনিয়োগ করলে বাংলাদেশ এতদিনে এ ক্ষেত্রে অনেক দূর এগুতে পারতো বলে বিশ্বাস করার যতেষ্ট কারণ আছে।

আইনের শাসন ও জবাবদিহিতার অভাব শিল্পায়নের একটি বড় বাধা। কাজ না করে পারিশ্রমিক নেয়া, টেন্ডারবাজি, সরকারি সম্পত্তি দখল ও আত্মসাত, মারামারি, সংঘর্ষের মত বেআইনী কর্মকান্ড সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মে পরিণত হয়েছে। এগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। নেই কোন জবাবদিহিতার বালাই। এ রকম এক জংলী পরিবেশে অবস্থান করে সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলো আমার মতে লোকসান কমই দিচ্ছে। আসলে দেশের শাসন ব্যবস্থায় কোনও জবাবদিহিতা নেই। সারাদেশে অবাধে চলছে চাঁদাবাজি, মাস্তানী, লুট-পাট, দুর্নীতি, খুন-খারাবি, নির্যাতন, দখল যার জন্য কোন বিচার হয় না। কাউকে এর জন্যে জবাবদিহিও করতে হয় না। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ উঠলো, সাংসদের বিরুদ্ধে সরকারী জমি-দখলের অভিযোগ উঠলো, কিন্তু কোনও তদন্ত হয় নি, বিচারও হয় নি। সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় দুর্নীতির-ঘুষের জরিপভিত্তিক রিপোর্ট দিয়েছে একটি প্রভাবশালী দেশের কুটনীতিক, একাধিক প্রভাবশালী দেশের প্রতিনিধিরা আইন শৃংখলার ভয়াবহতার কথা বলেছেন, আশংকা প্রকাশ করেছেন, এমন কি এদেশে তাদের নাগরিকদের সাবধানে চলাচল করতে বলেছেন। এত কিছুর পরও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না, উন্নতি হচ্ছে না (১৮, ১৯)। সরকারের একচোখা নীতির কারণে এটা হচ্ছে। অর্থাৎ সরকার বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে, সমর্থকদের বিরুদ্ধে

নিরবতা অবলম্বন করছে। আর এটা সুশাসন তথা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়।

দেশের শিল্পায়ন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হচ্ছে ***গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অনুপস্থিতি***। ১৯৭৫ এর ১৫-ই আগষ্ট থেকে ১৯৯০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে চলেছে সামরিক দুঃশাসন যা একে একে ধ্বংস করে দিয়েছে দেশের গণতান্ত্রিক বুনিয়াদকে। ১৯৯১ সালে ভোটের গণতন্ত্র আসলেও প্রকৃত গণতন্ত্র অদ্যাবদি নির্বাসিতই রয়ে গেছে। জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন হলেও স্থানীয় পর্যায়ে তা হয় নি, অথবা আংশিক হয়েছে। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দেশে ভিত্তি না পেলে বর্তমানের অরাজকতা চলতেই থাকবে এবং ব্যাহত হবে শিল্পায়নসহ গোটা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

শিল্পায়নের জন্যে প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশ এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার দেশ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা সে সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারি নি। বাংলাদেশ সমতলভূমির দেশ। এখানকার প্রায় ৯০% এলাকা সমতল। আমাদের দেশ ৪টি শক্তিশালী নদী প্রণালী দ্বারা বিধৌত। দেশের দক্ষিণ সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে সাগর-মহাসাগরের দিকে উম্মুক্ত। আমাদের দেশের রাজধানী শহর একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সর্বোপরি আমরা এক প্রজাতির মানুষের জাত-বাঙালী। জাপান, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরের মত দেশগুলো আমাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায় থেকেও তারা তাদের দেশকে শিল্পায়িত করতে পারলো, আর আমরা পারলাম না। জাপানের কোন প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল না। দেশটির প্রায় ৯০% পাহাড়-পর্বতময় এলাকার অন্তর্ভূক্ত। এতদসত্ত্বেও জাপানীরা তাদের ভৌগলিক অবস্থানকে (সাগর মহাসাগরের তীরে অবস্থান) কাজে লাগিয়ে অন্যদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (সোভিয়েত ইউনিয়নের বন, ইউরোপের লৌহ, এশিয়ার তেল ও কয়লা ইত্যাদি) ব্যবহার করে দেশে মৌলিক ভারী শিল্প গড়ে তুলে ছিল, দেশকে শিল্পায়িত করেছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পৃথিবীতে পরিবহনের ক্ষেত্রে জলপথ সবচেয়ে সস্তা। কারণ জলের জন্যে কোন দাম দিতে হয় না। সিংগাপুর সম্পূর্ণরূপে অন্যদেশের সম্পদকে ব্যবহার করে দেশকে শিল্পায়িত করেছে। মালয়েশিয়া ঐপনিবেশিক শাসন ও শোষণ সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর সঠিক নীতি-পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে দেশকে শিল্পায়িত করতে সক্ষম হয়েছে (২, ৪, ৭)।

উপরোক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে এখন আমরা কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো। সুপারিশগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১। ***একটি সুদূরপ্রসারী, সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ শিল্পনীতি প্রণয়ন করতে হবে***। শুধু রপ্তানীমুখী, শুধু আমদানি বিকল্প নয়, শিল্পনীতি হবে এ দুয়ের একটি সুসমন্বিত রূপ। বিপুল সংখ্যক মানুষকে কাজ দিতে হলে, রপ্তানীর বহুমুখীকরণ করতে হলে শিল্পায়নের কোনও বিকল্প নেই। আর তাই শিল্প নীতিতে মৌলিক ভারী শিল্পের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ এ শিল্পই শিল্পায়নের ভিত রচনা করে এবং অন্যান্য খাতের বিশেষ করে কৃষি ও পরিবহনের আধুনিকায়নে মুখ্য ভূমিকা রাখে। বৃটেন, জাপান, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া ও ভারতের মত রাষ্ট্রগুলো শিল্পায়ন শুরু করেছিল হাল্কা শিল্প দিয়ে। কিন্তু টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্যে সময়ের সাথে সাথে তারা মৌলিক ভারী শিল্প গড়ে তুলেছিল ঃ (২, ৪, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৬, ১৭)। সিংগাপুর ৬০-এর দশকে শিল্পায়ন শুরু করেছিল হাল্কা শিল্প ও রিএক্সপোর্ট ব্যবসা দিয়ে। ৭০-এর দশকে তারা বিশেষ নজর দেয় মৌলিক ভারী শিল্পের উপর। ৮০-এর দশকে এসে গুরুত্ব দেয় হাইটেক শিল্পের

উপর। আর এসব কারণেই তারা দেশকে শিল্পায়িত করতে পেরেছে এবং সাম্প্রতিককালের পূর্ব এশিয়ার সংকট থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে। ভারত ও মালয়েশিয়াও একইভাবে এগিয়েছে। ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প থেকে শুরু করে পারমানবিক বিদ্যুত কেন্দ্র পর্যন্ত মৌলিক ভারী শিল্পের এক শক্ত ভিত গড়ে তুলেছে যা শিল্পায়নসহ অন্যান্য খাতের দ্রুত ও টেকসই বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

২। ***রাষ্ট্রীয় খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরাষ্ট্রীয়করণ বন্ধ করতে হবে***। বেসরকারী খাত স্বাভাবিক নিয়মে বিকশিত হবে। রাষ্ট্র পদত্ত্ব সকল সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে ব্যক্তিগত উদ্দ্যেক্তারা দেশের শিল্পায়নে অংশগ্রহণ করবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় খাতের বিনিময়ে বেসরকারী খাতের বিকাশ যেন না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশে এটাই হয়েছে। যেমন, সরকারী বাস বন্ধ রেখে বেসরকারী বাস চালাতে দিতে হবে। রেল লাইনের বিকাশ বন্ধ রেখে বাস, ট্রাকের ব্যবসা করতে দিতে হবে ইত্যাদি। আর সেকারণেই ৩৩ বছরে বাংলাদেশে রেল লাইনের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ কিঃ মিঃ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭২ সালের ২,৮৭৪.৩ কিঃ মিঃ থেকে ২০০৩ সালে ২,৬৬৮ কিঃ মিঃ এসে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্যজনকই বটে। দুনিয়ার সকল শিল্পায়িত দেশে উন্নয়নের সাথে সাথে রেল লাইনের দৈর্ঘ্য বছরের পর বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ স্থলপথের মধ্যে রেলপথ হচ্ছে সবচেয়ে সস্তা, নির্ভরযোগ্য ও দ্রুত। কাজেই শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় রেল পথের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। আর সম্ভবত বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সেকারণেই বলতে শুরু করেছেন যে, বাংলাদেশে ব্যবসার খরচ বেশী।

বাংলাদেশ রেলওয়েসহ সকল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করতে হবে। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি করে এ সকল প্রতিষ্ঠানে জরিপ চালাতে হবে। এ ধরনের জরিপের ফলে বেড়িয়ে আসবে সকল ত্রুটী-বিচ্যুতি ও সুবিধা-অসুবিধা যার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে ঃ

(ক) পুরনো যন্ত্রপাতি বদলিয়ে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে ;
(খ) অব্যবহৃত সম্পত্তির অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে ;
(গ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে ;
(ঘ) বেতন ও পারিশ্রমিক উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে, অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বেতন ও পারিশ্রমিক বাড়বে, আর কমলে বেতন ও পারিশ্রমিকও হ্রাস পাবে।

এভাবে, রাষ্ট্রীয় খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করতে হবে এবং বেসরকারী খাতের সাথে তাদেরকে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। চীনের সংস্কার এভাবেই হয়েছে। সেখানে সংস্কারের ফলে রাষ্ট্রীয় খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এখন লাভজনক হয়েছে, দক্ষ হয়েছে। এখানে উল্লেখের দাবি রাখে যে, পচাঁত্তর পরবর্তী সরকারগুলোর মধ্যে একমাত্র শেখ হাসিনার সরকার (১৯৯৬-২০০১) এ বিষয়ে কিছু মনোযোগ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান জয়দেবপুরের বাংলাদেশ মেশিন-টুলস ইন্ডাষ্ট্রি সেনাবাহিনীর কাছে এবং খুলনার শিপইয়ার্ড নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয় এ সময়ে। শোনা যাচ্ছে যে, এ কারখানা দুটো ইতোমধ্যেই লাভজনক হয়েছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাঁজোয়া জান, বোট থেকে আরম্ভ করে

অনেক যন্ত্রপাতি এ কারখানা দুটোতে উৎপাদন করা হচ্ছে, মেরামত করা হচ্ছে অনেক যন্ত্রপাতি ও জাহাজ। আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করলে এ কারখানা দুটো আরও লাভবান হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর ফলে দেশের অনেক বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে এবং দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে। কারণ এ সকল পণ্য বিদেশ থেকে ক্রয় করতে হলে বিদেশী মুদ্রায় তা করতে হতো যেমনটা পূর্বে করা হতো এবং যেকোন ক্রয়ের সাথে কমিশনের ব্যাপার জড়িত থাকে। এ ছাড়াও শেখ হাসিনার সরকার ৮টি বস্ত্র ও পাটকল শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন এবং পশ্চাদসংযোগ শিল্প স্থাপনের উদ্দ্যোগ নিয়েছিলেন যেগুলো সম্পর্কে এখন আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। পশ্চাদপদ এলাকার শিল্পায়নের জন্যে শেখ হাসিনার সরকার দেশের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে তিনটি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গঠন করেছিলেন ঃ মঙ্গলা, ঈশ্বরদী ও উত্তরা। শোনা যাচ্ছে এগুলো নাকি বর্তমান সরকার বন্ধ করে দিয়েছে (১৮, ১৯)। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর আত্মীয় দাবিদার সরকারগুলো কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ব কারখানার ব্যাপারে এ রকম সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা কখন চিন্তাও করে নি। শেখ হাসিনার সরকার এ রকম একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত না নিলে আজকে হয়ত উপরোক্ত দু'টো মৌলিক ভারী শিল্পকে আদমজী পাটকলের ভাগ্যই বরণ করতে হতো।

৩। সরকারের রাজস্ব ও ব্যাংকিং নীতি অবশ্যই শিল্পায়নের সহায়ক হতে হবে, ***ঢেলে সাজাতে হবে রাজস্ব ও ব্যাংকিং নীতিকে***। পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে প্রত্যক্ষ কর থেকে রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে। বর্তমানে কর রাজস্বের প্রায় ৯০% আসছে পরোক্ষ কর থেকে যার ভার বহন করতে হচ্ছে সাধারণ জনগণকে। এতে করে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সঞ্চয় কমে যায়। বিনিয়োগের উপর এর প্রভাব হয় ঋণাত্মক। বর্তমানে এ রকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলোর পরামর্শে সরকার অন্ধ ব্যয় সংকোচন নীতি অনুসরণ করলেও সরকারের অনুৎপাদনশীল ব্যয় বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। তার প্রমান সরকারের বিশাল মন্ত্রী পরিষদ (মন্ত্রীর পদমর্যাদাভোগকারীসহ ৭৩ জনের মত)। এর উপরে বর্তমান বাজেটে মন্ত্রী ও সাংসদদের বেতন ও ভাতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অথচ প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্যে কোন বেতন স্কেল দেয়া হয় নি। ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিরক্ষা ও শান্তি শৃংখলা খাতে। কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে। অথচ লোকশানের অজুহাতে ব্যাংকিং কার্যক্রম সংকুচিত করা হচ্ছে। এমনিতেই আমাদের ব্যাংকগুলো গ্রামে যেতে চায় না, শহরে থাকতে পছন্দ করে। এ সংকোচন নীতির ফলে কৃষি অর্থনীতিতে ঋণ প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে যার প্রভাব পড়বে কৃষি উৎপাদনের উপর (১৮, ১৯)। আমরা মনে করি গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে বিশেষ করে শিল্প ও কৃষি খাতে ঋণ প্রবাহ বাড়ানোর জন্যে সম্প্রসারণ নীতিই অনুসরণ করা উচিত। দেশের শিল্পায়ন ও মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্যে অবশ্যই সরকারকে সম্প্রসারণশীল নীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে অবশ্যই উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে, অনুৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে নয়।

৪। ***শান্তি ও উন্নয়ন সমার্থক***। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে শিল্পায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কোনটাই হবে না। ২০০১ এর ১লা অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের পর দেশ ক্রমান্বয়ে সংঘর্ষের দিকে এগিয়েছে যা বর্তমানে নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে পড়েছে। এমন কি সরকার দলীয় বিশিষ্ট একজন শিল্পপতি অপহৃত হওয়ার ৩ মাসেও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী তাকে উদ্ধার করতে পারে

নি। ইদানিং বেশ কয়েকজন শিল্পপতি-ব্যবসায়ীকে সন্ত্রাশীরা ঠায় মেরে ফেলেছে (১৮, ১৯)। পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বিগত সরকারের আমলে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে সেখানে পুনরায় সন্ত্রাশী কর্মকান্ড ছড়িয়ে পড়ছে। যত সম্ভাবনাই থাকুক না কেন দেশে অশান্তি থাকলে কখনই শিল্পায়ন হবে না, উন্নয়ন হবে না। সরকারকে এটা অনুধাবন করতে হবে। অতএব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সরকারকে সৎ, আন্তরিক ও উদ্যোগী হবে।

৫। *আইনের শাসন ও জবাবদিহিতার বিষয়টি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।* গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ না করলে প্রথম দু'টো কখনই বাস্তবায়িত হবে না। সরকারকে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপলব্দি করতে হবে। ভারত, মালয়েশিয়া, সিংগাপুরের মত দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করায় শিল্পায়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। কারণ আইনের শাসন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বাংলাদেশের গ্রাম সরকারের কথা মনে হলে আমার ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের কথা স্মরণ হয়। কি করুণ পরিণতিই না হয়েছিল মৌলিক গণতন্ত্রের (ষড়যন্ত্রের) এবং এর উদ্ভাবকের ! উপজেলা ও জেলা পরিষদের নির্বাচন বাদ দিয়ে উপর থেকে গ্রামে চাপিয়ে দেয়া হলো গণতন্ত্র যার নাম দেয়া হলো গ্রাম সরকার। এতে কি অশান্তি আরও বাড়বে না? আমরা সত্যিই আতংকিত এর পরিণতির কথা ভেবে। সুতরাং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কথায় নয়, ষড়যন্ত্রে নয়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে কাজে, বাস্তবে-সরকারের প্রতিটি স্তরে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরাই দেশ চালাবে, কোন আমলা বা স্বৈর শাসক নয়।

৬। *বিপনন সমস্যা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা।* এ ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীন বাজারের বিকাশের উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। সরকার তার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ করতে পারে। এ সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হয়েছে (রাজস্ব নীতি)। সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সরকার বাধ্যতামূলকভাবে ক্রয় নীতির মাধ্যমে সহায়তা দিতে পারে। এ ধরনের নিয়ম ভারতে অনুসরণ করা হয় (১১)। ভারতের নির্বাচন কমিশন সকল ভোট বাক্স (ষ্টীলের) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ভারত ষ্টীল থেকে ক্রয় করে। আমাদের দেশে এটা করা হয় না। এখানে টেন্ডার দিয়ে বিদেশ থেকে ক্রয় করা হয় তাতে স্বার্থন্বেসীদের লাভ হলেও দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিলের ঘূর্ণী ঝড়ের পর ত্রান মন্ত্রনালয় টেন্ডারে টিন ক্রয় করেছিল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদেরকে রিলিফ হিসেবে দেয়ার জন্যে। অথচ ঐ সময়ে চট্টগ্রাম ষ্টীল মিলে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার টিন স্তুপ হয়ে পড়েছিল। অথচ এ টিনগুলো ত্রান মন্ত্রনালয় ক্রয় করলে প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক হতে পাড়তো, সমস্যায় পড়তো না। পরবর্তীতে এ কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। একটা মৌলিক শিল্প এভাবে বিপনন সমস্যায় পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল, আর সরকার চোখ বন্ধ করে থাকলো। কোথায় দেশপ্রেম? জেনারেল ইলেট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড টেন্ডার দিয়ে অন্য দেশ থেকে বিদ্যুতিক ষড়ঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করছে, অথচ উপরোক্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানটি বিপনন সমস্যায় পড়ে লোকসান গুনেছে এবং বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব সরকারী ক্রয় নীতিতে মন্ত্রনালয়সহ সকল সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কেনা-কাটার ক্ষেত্রে সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্য ক্রয় বাধ্যতামূলক করতে হবে।

বিদেশে বাংলাদেশের শিল্প পণ্যের বাজার অনুসন্ধ্যান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ***অর্থনৈতিক কুটনীতি আরও চাঙ্গা করতে হবে***। শেখ হাসিনার সরকার এদেশে প্রথম অর্থনৈতিক কুটনীতি চালু করেছিল। বিদেশে আমাদের দূতাবাসগুলো দেশের অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা করে না, করে নিজেদের অর্থনীতি নিয়ে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস। বাংলাদেশের নাগরিকদের পাসপোর্ট নবায়নের প্রায় ৩ কোটি টাকা নাকি দূতাবাস আত্মসাত করেছে (১৯)। কাজেই দূতাবাসগুলোকে দুর্নীতিমুক্ত করে অর্থনৈতিক কুটনীতিতে পারদর্শী করে তুলতে হবে। এরা শুধু সরকারী খাতের নয় ব্যক্তিগত খাতের উৎপাদিত পণ্যেরও বাজার অনুসন্ধ্যান করবে। মোট কথা এ ব্যাপারে বিস্তারিত কর্মসূচী প্রনয়ন করে তাদেরকে দিতে হবে।

৭। বেসরকারী খাতের বিকাশের আমরা বিরোধী নই। ***তবে সরকারী টাকায় (জনগণের করের টাকা) বেসরকারী খাতকে পোষার আমরা ঘোর বিরোধী***। বলা হচ্ছে বেসরকারী খাত দক্ষ, আর সরকারী খাত অদক্ষ। তাহলে কেন নগদ সহায়তা দেয়া হবে? আমাদের দেশের মত স্বল্পোন্নত দেশে সরকারের উদ্দ্যেগী ভূমিকা অবশ্যই থাকবে। বেসরকারী খাতকে যে সকল সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে তার যেন অপব্যবহার না হয় সেদিকে রাষ্ট্র অবশ্যই দৃষ্টি রাখবে। ভারত, সিংগাপুর ও মালয়েশিয়া তা সুষ্ঠুভাবে করেছে বলেই তারা সফলকাম হয়েছে-শিল্পায়িত করতে পেরেছে দেশকে। আমাদের ব্যক্তিগত মালিকরা ব্যাংকের টাকা নিয়ে বিনিয়োগ করলো না, ফেরত দিল না, শুল্ক রেয়াতের সুযোগ নিয়ে অবৈধ ব্যবসা করলো, দেশকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিল। অথচ সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় নি। এরকম হলে তো শিল্পায়ন হবে না। কাজেই এ দিকটায় বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

৮। ***সরকার ব্যয় সংকোচনের কথা বলছেন***। অথচ সরকার বিশাল এক মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। সম্ভবতঃ বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ (৭৩ জন)। এ বিশাল মন্ত্রীসভা দেখে মনে পড়ছে পুরনো সেই কথা "মানি নো প্রব্লেম"। মাত্র ১ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটারের ক্ষুদ্র দেশটির শাসনের জন্যে কি এত মন্ত্রীর দরকার আছে? এর উপরে আবার মন্ত্রী ও সাংসদদের বেতন-ভাতার গগণচুম্বী বৃদ্ধি ! তাহলে কি দাঁড়ালো? সরকার বলছে ব্যয় সংকোচনের কথা আর নিজেই ব্যয় বাড়িয়ে চলছে। তাহলে সরকারের অধীনস্তরা, আজ্ঞাবহরা কি করবে? এ প্রসঙ্গে মনিষী শেক্সপিয়ারের একটা কথা মনে পড়ছে, "দেশের রাজা যদি অন্যায়ভাবে ডিম অমলেট খায়, তাহলে তার প্রজারা মুরগী রোষ্ট খাবে"। অতএব ব্যয় সংকোচনের ক্ষেত্রে সরকার ও জনপ্রতিনিধিদের নজির সৃষ্টি করতে হবে। মন্ত্রী পরিষদের আয়তন বিশের কোঠায় নিয়ে আসতে হবে। বর্ধিত বেতন পরবর্তী নির্বাচনের পর কার্যকর করতে হবে- এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শুধু এ খাতের সাশ্রয়কৃত টাকা দিয়ে বাংলাদেশে আগামী তিন বছরে কমপক্ষে ২ ডজন বিজ্ঞান ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যাবে শিল্পায়নের জন্যে যা অত্যন্ত দরকার।

৯। ***শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি***। আর দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হলে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করা আবশ্যক। আমলাদের দ্বারা এটা হবে না। এ কাজে ছাত্র সমাজকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় ৬ মাস বসে থাকে। এ সময়টায় তাদেরকে এ রকম একটা জাতীগঠনমূলক কাজে লাগানো উচিত। এতে করে তাদের মধ্যে দেশাত্ববোধ জাগ্রত হবে। তারা দেশকে ভালবাসতে শিখবে। কারিগরি

প্রশিক্ষন কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়ানো আবশ্যক। সম্ভব হলে প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি করে বহুমুখী কারিগরি প্রশিক্ষন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক। শুধু ইংরেজীর উপর গুরুত্ব দিলেই হবে না। বিশ্বের প্রধান ভাষাগুলোর উপর বিশ্ববিদ্যালয ও সম্ভব হলে কলেজগুলোতে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু করা প্রয়োজন। সর্বোপরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা জরুরী। ভাল কোন কাজ যে-ই করুক না কেন তা এগিয়ে নেয়া উচিত। বলছিলাম বিগত সরকারের আমলে স্থাপিত ১২ টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা যার মধ্যে ৯ টি-ই বর্তমান সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ তারাই অন্য জায়গায় একই ধরনের বিশ্ববিদ্যায়ের ভিত্তি স্থাপন শুরু করেছে। পাড়লে আরও এক ডজন বিশ্ববিদ্যালয় করা যেতেই পারে। কিন্তু তা শুরু করাগুলো বন্ধ করে নয়। এতে করে দেশ পিছিয়ে যায়, অপচয় বৃদ্ধি পায়। আমরা মনে করি, বাজেটে সকল ধরনের অপ্রয়োজনীয় ও অনুৎপাদনশীল ব্যয় হ্রাস করে শিক্ষাখাতের ব্যয় বৃদ্ধি করা উচিত। বাজেটের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ শিক্ষা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দকরা উচিত। দেশের শিল্পায়ন চাইলে সমান্ত রালভাবে অন্যান্য কাজের সাথে সাথে এ কাজটি অবশ্যই করতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের শিল্পায়ন নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। আমরা শুরু করেছি, শেষ করিনি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শুরুই করিনি। আমরা পরের কথায় বন্ধ করছি, কিন্ত দেশের কথা ভাবছিনা। আদমজী শুধু একটি পাটকল নয়। আদমজী আমাদের গৌরব। আদমজী আমাদের জীবন। আদমজী আমাদের সংস্কৃতি। আদমজী বাংলাদেশের নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস। আদমজী বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে। আদমজীর জায়গায় অন্য শিল্প করলে ৮-১০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে-এমন ঘুম পাড়ানী গল্প শুনিয়ে লাভ হবে না। ও রকম গল্প আমরা একযুগ আগেও শুনেছিলাম কর্ণফুলীর পূর্ব পাড় ইপিজেডের নামে দক্ষিণ কোরিয়াকে দিয়ে দেয়ার সময়। বলা হয়েছিল ওখানে সোয়া লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। সোয়া লাখ তো দূরের কথা সোয়া হাজারেরও কর্মসংস্থান হয় নি। হাতে গোনা নাম মাত্র কয়েকটি কারখানা গড়ে উঠেছে। অতএব, দেশের তথা শিল্পায়নের স্বার্থে আদমজীর পুনরুজ্জীবন আবশ্যক। আধুনিকায়ন ও এর সকল সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করে একে লাভজনক করতেই হবে। বন্ধ যদি বাংলাদেশের কোন শিল্পকে করতেই হয় তবে তার নাম হওয়া উচিত কাফকো (এরশাদ আমলে স্থাপিত)। কাফকো কখনই বাংলাদেশের জন্য লাভজনক ছিল না, আর কখনও হবেও না। এ কারখানাটি স্থাপন করা হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে।

শিল্পায়ন একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। এর সাথে অনেক বিষয় জড়িত। এর সাথে শিক্ষা, কৃষি, পরিবহনসহ অনেক খাতের সমান্তরাল বিকাশের প্রশ্ন জড়িত। কাজেই শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন সুসমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও ভারসাম্যপূর্ণ পদক্ষেপ। বিচ্ছিন্ন কোন পদক্ষেপে কাজ হবে না। এটা আমাদের নীতি

নির্ধারকরা যত দ্রূত উপলব্ধি করবেন ততই শিল্পায়নের কাজটি এগিয়ে নেয়া সহজ হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. Abalkin L., Dzarasov S. & Kulikov A.: Political Economy–A Short Course, Progress, Moscow, 1983.

২. Antipov V. N.: Singapore, Moscow, 1982.

৩. Baranov S. S.: East Bengal–Features of Economic Development 1947-1971 Moscow, 1976.

৪. Buchanan I: Singapore in South East Asia- An Economic and Political Appraisal, London, 1972.

৫. Ghosh A. & Ghosh B.: Economic Principles and Economic Problem of India, Calcutta, 1997.

৬. Khan M. M. H.: Problems and Prospects of Trade Expansion Between Bangladesh and other SAARC Countries, in the Book: "Recent Trends of Economic Reforms in SAARC Region", IIDS, Calcutta, India, 1998.

৭. Kurzanov V. N.: Industrial Development of Singapore, Moscow, 1978.

৮. Myrdal G.: Problems of the "Third World", Moscow, 1972.

৯. Nikitin P. I. The Fundamentals of Political Economy, Progress, Moscow, 1983.

১০. Rumiantsev A. M. & others. Economic Encyclopaedia in 4 Volumes, Moscow, 1972.

১১. Shirokov G. K. The Economy of India- Sectoral Analysis, Moscow , 1980.

১২. Vinogradov V. A. & others. History of Socialist Economy of The USSR in 7 Volumes, Moscow, 1980.

১৩. বসাক অ. ও চক্রবর্তী অ. ভারতের অর্থনীতির পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৯৭।

১৪. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৯৬-২০০০, ঢাকা।

১৫. The World Bank. 2003 World Development Indicators, Washington D.C., 2003.

১৬. Singapore Development Plan-1961-1964, Singapore, 1963.

১৭. U.N. Industrial Development of Asia and the Far East. Principal Documents for the Second Asian Conference on Industrialization, New York, 1971.

১৮. সংবাদ

১৯. জনকণ্ঠ